Article Information
Article Submission Date: 26/08/2025
Article Reviewed: 19/09/2025 & 16/10/2025
Article Acceptance: 29/10/2025
ISSN: 1682-1114
DOI: https://www.doi.org/10.62069/PVP.V15A5

পুরাণের নারীর বিনির্মাণ: পরিপ্রেক্ষিত সেলিম আল দীন রচিত *শকুন্তলা* নাটক

Reconstructing Female Subjectivity in Myth: A Critical Reading of Selim Al Deen's *Shakuntala*

ফারজানা নাজ স্বর্ণপ্রভা*

Abstract

Since ancient times, mythological stories and characters have been presented in a new perspective over time. Similarly, in Bengali drama, the characters of Puranas have been presented in different ways at different times. The present article will discuss the construction and modernization of the mythological female character Shakuntala through the Bengali play *Shakuntala* written by Selim Al Deen. Because, the process of transforming women through mythology reflects a vast cultural change that will help identify the position of women in society, their independence, subordination, and various forms of power. In this present article, our research topic is to observe the form of construction of the mythical female character named Shakuntala in the play *Shakuntala* written by Selim Al Deen. The research paper will be written using descriptive and comparative research methods using primary sources. The essay will present the narrative and various data analysis in light of the theory, and the researcher's own interpretations, observations, and perspectives.

* সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকাল থেকেই সময়ের ক্রমবিবর্তনে পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রদের নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা শুরু হয়েছিল। বাংলা নাটকেও একইরূপে পুরাণের চরিত্রনিচয় নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে সেলিম আল দীন রচিত বাংলা নাটক *শকুন্তলা*র মাধ্যমে পৌরাণিক নারী চরিত্র শকুন্তলার বিনির্মাণ এবং তাঁর আধুনিকীকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। কেননা, পুরাণের অভ্যন্তর দিয়ে নারীর রূপ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া একটি বিশাল সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রতিফলনস্বরূপ– যা সমাজে নারীর অবস্থান, তাঁদের স্বাধীনতা-পরাধীনতা-অধীনতা এবং ক্ষমতার বিচিত্ররূপকে চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হলো সেলিম আল দীন রচিত *শকুন্তলা* নাটকে পৌরাণিক শকুন্তলা নামক নারী চরিত্রের বিনির্মাণের রূপ পর্যবেক্ষণ। প্রাথমিক উৎস ব্যবহার করে বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতিতে গবেষণা-প্রবন্ধটি রচিত হবে। তত্ত্বের আলোকে আখ্যান ও বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং গবেষকের নিজস্ব ব্যাখ্যা, পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রবন্ধে উপস্থাপিত হবে।

মূলশব্দঃ পুরাণ, বিনির্মাণ, শকুন্তলা, মিথ, রোলা-বার্থ

বাংলা নাটকে পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রের বিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীর গবেষণার বিষয়। সময়ের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণভিত্তিক চরিত্র ও গল্পগুলোর পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠন দেখা যায়; যা কেবল অতীতের প্রতিফলন নয়, বরং সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। বাংলা নাট্যধারায় এই প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়– যেখানে কল্পনা, আদর্শ এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণে প্রাচীন কাহিনিগুলো নতুন অর্থ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাৎপর্য লাভ করেছে। আধুনিক বাংলা নাটকে বিশেষত পৌরাণিক নারী চরিত্রগুলোর পুনর্নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। পুরাণের নারী চরিত্রগুলোকে কেবল দুর্বল কিংবা ঋণাত্মক চরিত্র হিসেবে দেখানোর পরিবর্তে আধুনিক বাংলা নাটক কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর যন্ত্রণা, সংগ্রাম, সাহসিকতা, আত্মবিশ্বাস এবং প্রতিরোধের দিকসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে নারীর শুদ্ধতা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আত্মবিশ্বাসকে নতুনরূপে সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষ করা গেছে। ফলে নারী চরিত্রগুলো আর কেবল নায়িকা বা প্রেমিকার সীমানায় সীমাবদ্ধ থাকে না; তারা হয়ে ওঠে সামাজিক ক্ষমতা, আত্মপরিচয় এবং মানবিক মর্যাদার প্রতীক। বর্তমান প্রবন্ধে সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) রচিত *শকুন্তলা* নাটককে কেন্দ্র করে পৌরাণিক নারী চরিত্র শকুন্তলার আধুনিকীকরণ, রূপান্তর ও বিনির্মাণ এর রূপরেখা বিশ্লেষণ

করা হবে। নাটকটি প্রাচীন কাহিনিকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে পুনর্বিবেচনা করে। যেখানে শকুন্তলার চরিত্র কেবল প্রেমের নায়িকা নয়, বরং আত্মসম্মান, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়িত্বের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত। এই রূপান্তর বাংলা নাটকে নারীর অবস্থান, ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার ধারণাকে নতুন প্রেক্ষাপটে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। সার্বিকভাবে, পুরাণভিত্তিক নারী চরিত্রের এই বিবর্তন কেবল নাটকের রূপগত পরিবর্তনের প্রতিফলন নয়। বরং, এটি একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে; যা সমাজে নারীর সম্ভাবনা, ক্ষমতা এবং মানবিক মর্যাদার ব্যাপ্তিকে নতুনভাবে চিহ্নিত করে।

একথা সকলেই অবগত যে, উনিশ ও বিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত থিয়েটার চর্চা শুরু হলে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্ধনের সূচনা ঘটে। এমনকি সেসময়ের নাট্যকারগণ ঐতিহ্যের আবাহনে অবগাহনও করেন। ফলে পৌরাণিক নারী চরিত্রসমূহ কাহিনির ধারাবাহিকতায় কখনো হুবহু অনুকরণ আবার কখনোবা পুনর্নির্মিত হয় যুগের চাহিদার নিরীখে। বলা যায়—

> যখন পুরনো ও প্রথানুগ সমাজ-কাঠামোয় সর্বতোভাবে নতুন জীবনোপলব্ধি, অজ্ঞাতপূর্ব বিশ্বাস ও বিচার প্রবণতা এবং মূল্যবোধের অভিব্যক্তি প্রতিস্রোতের আবর্ত তৈরি করে, কেবলমাত্র সে-সময় দেখা দেয় নতুন যুগ আর সেই যুগের উপযোগী জীবন ভাষ্য। নতুন প্রকাশমাধ্যম জন্ম নেয়। পুরনো বিষয়বস্তু যেমন ক্রমশ অনিবার্যভাবে নিস্প্রভ হয়ে পড়ে, তেমনি নতুন বিষয়বস্তুর সার্থক উপস্থাপনের জন্য অভিনব আঙ্গিক ও রচনাশৈলী দেখা দেয়। (ভট্টাচার্য, ১৯৯৭: ৬১)

উনিশ শতকে ব্রিটিশ প্রভাবিত নাট্য কিংবা বাংলা সাহিত্য ধারায়ও উল্লিখিত মতামতের স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা লক্ষ করি, প্রাচীন ও মধ্যযুগে সাহিত্যচর্চায় কাহিনি বিন্যাস এবং আঙ্গিক শৈলী উভয়েরই বিস্তর পরিবর্তন সূচিত হয়। সেই সাথে সূচিত হয় আধুনিক পদবাচ্য স্বীকৃত বাংলা সাহিত্যধারা। নাট্যশিল্পও ছিল তারই অন্তর্ভুক্ত একটি শাখা। ফলে, আধুনিক চিন্তা-ভাবনা ও মননের ছাপ পড়ে নাট্যঘটনা ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও। আধুনিক ধারার নাট্যচর্চার সূচনা পর্বে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের পাশাপাশি ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনি ও চরিত্রের সন্নিবেশও ছিল বহুল। তন্মধ্যে নাট্যকারগণ যেমন স্বকীয় সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন— তেমনি কেউ কেউ করেছেন পুরাণের অন্ধ অনুকরণ। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হলো সেলিম আল দীন রচিত *শকুন্তলা* নাটকে পৌরাণিক শকুন্তলা নামক নারী চরিত্রের বিনির্মাণের রূপ তথা স্বরূপ পর্যবেক্ষণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, Roland Barthes-এর Mythologies (১৯৫৭) আধুনিক পশ্চিমা সমাজে মিথের পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনার একটি মৌলিক পাঠ। তিনি মিথকে কেবল প্রাচীন কাহিনির ধাঁচে না দেখে আধুনিক সমাজের 'speech' বা 'ভাষা' হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি, "Myth is a type of speech" (Hill and Wang, 1972:109)– এর মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে মিথ আসলে একটি সাংকেতিক ভাষা, যা প্রতিনিয়ত নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে গঠন ও প্রভাবিত করে। অর্থাৎ মিথ এমন এক ভাষা যা প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক সংস্কৃতিতে নতুন নতুন রূপ নেয় এবং সামাজিক চেতনার প্রতিফলন ঘটায়।

বার্থের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আধুনিক জীবনের নানা উপাদান— যেমন সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র, পোশাক, খেলাধুলা—সবই এক ধরনের 'মিথ' তৈরি করে। এগুলোর মাধ্যমে সমাজ একটি নির্দিষ্ট আদর্শ, মান বা চিন্তা দর্শনের প্রচার করে থাকে, যা সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিক সত্য হিসেবে গেঁথে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন শুধুই একটি পণ্যের প্রচার নয়; সেটি নারীর সৌন্দর্য, গ্রহণযোগ্যতা এবং সমাজে তার অবস্থান নিয়ে এক ধরনের মিথ নির্মাণ করে। তাঁর ভাষায়, এই ধরনের প্রতীকী নির্মাণকে "bourgeois myth" বলা যেতে পারে— যা উচ্চবিত্ত ও পুঁজিবাদী আদর্শকে সাধারণ মানুষের 'স্বাভাবিক' চিন্তাভাবনার অংশ করে নেয়।

এ প্রসঙ্গে তার "semiological chain" বা 'অর্থ-বিশ্লেষণের শৃঙ্খল' তত্ত্বটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রতিটি চিহ্ন (sign) দুইটি অংশে বিভক্ত: একটি হচ্ছে 'signifier' (চিহ্নক), অপরটি 'signified' (চিহ্নার্থ)। রোলা বার্থ দেখান যে, একটি সাধারণ চিহ্ন যখন সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রবেশ করে, তখন সেটি তার নিজস্ব স্বাভাবিক অর্থ হারিয়ে "second-order myth" বা "দ্বিতীয় স্তরের মিথ"-এ রূপান্তরিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন ফরাসি সৈনিকের ছবি— যে একজন কৃষ্ণাঙ্গ এবং ফ্রান্সের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, তা কেবল সামরিক প্রতিনিধিত্ব নয়; এটি হয়ে ওঠে ফ্রান্সের উপনিবেশবাদী ন্যায়বিচার এবং 'racial harmony' এর এক কৃত্রিম চিত্র। বার্থ দেখান, এই রকম নির্মাণই মিথ, যা সমাজে ক্ষমতার কাঠামো বজায় রাখতে সহায়ক হয়।

এই তত্ত্ব বাংলা নাটকে পৌরাণিক নারীর চিত্রায়ণ ও নির্মাণ বিশ্লেষণে কার্যকর হতে পারে। বাংলা নাট্যজগতে পৌরাণিক নারী চরিত্র যেমন— সীতা, গান্ধারী, কুন্তী বা দ্রৌপদী কেবল একটি নির্দিষ্ট পৌরাণিক আখ্যানের অন্তর্গত চরিত্র হিসেবে নয়, বরং একটি সাংকেতিক প্রতীক বা মিথ হিসেবে উপস্থাপিত হয়। নাট্যকারগণ

এই চরিত্রগুলোর মাধ্যমে বিশেষ সামাজিক বার্তা প্রদান করেন— যেমন নারীর আত্মনিয়ন্ত্রণ, প্রাতিষ্ঠানিক পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, কিংবা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ইত্যাদি। এই প্রতীকায়ন বার্থের মিথ তত্ত্বের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত, কারণ এখানে নারী সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব হিসেবে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করছেন। যেমন, শাঁওলী মিত্রের নাটক *নাথবতী অনাথবৎ*-এ দ্রৌপদী কেবল পাঁচ স্বামীর স্ত্রী নন; বরং তিনি হয়ে ওঠেন এমন এক নারীর প্রতীক, যাকে সমাজ বার বার বিভক্ত করে, অথচ সে নিজেই নিজের প্রশ্ন ও অস্তিত্বের উত্তর খুঁজে পেতে চায়। ঠিক তেমনই, সেলিম আল দীনের *শকুন্তলা* নাটকে শকুন্তলা চিহ্ন হয়ে ওঠে রাষ্ট্র ও ধর্মের যৌথ নির্মাণের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদের ভাষায়; যেখানে স্বর্গ-মর্ত্যের দ্বন্দ্বের আড়ালে সক্রিয় থাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতিচ্ছায়া। এই পুনর্নির্মাণগুলোর পেছনে রোলা বার্থ-এর "Myth as depoliticized speech" (Howard, 1972:145) ধারণাটিও প্রাসঙ্গিক, যেখানে মিথ রাজনৈতিক সত্যকে অরাজনৈতিক বা 'স্বাভাবিক' হিসেবে উপস্থাপন করে, অথচ নাটকের ভাষ্যে সেই স্বাভাবিকতাকেই উন্মোচন করে প্রতিবাদ জানানো হয়।

সার্বিকভাবে, বার্থের মিথ তত্ত্ব সেলিম আল দীন এর নাটকে পৌরাণিক নারীর পুনর্নির্মাণকে শুধু সাহিত্যিক বা নাট্যচর্চার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পাঠ হিসেবে বিবেচনা করতে সহায়তা করে।

প্রবন্ধের মূল বিষয়ে আলোচনা শুরুর আগে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রত্যয় 'পুরাণ' এবং 'বিনির্মাণ' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতীয় তথা সংস্কৃত সাহিত্যে 'পুরাণ' শব্দটির তাৎপর্য মহিমান্বিত এবং ব্যাপক আকার লাভ করে আছে। বিশেষত, ধ্রুপদী সাহিত্যে মহাকাব্য, সংহিতা, বেদ এবং পুরাণ শব্দগুলো বহুল অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। জানা যায়, সূত্র সাহিত্যে প্রথম পুরাণ নামক স্বতন্ত্র শব্দ উল্লেখ থাকলেও বেদ এবং উপনিষদসমূহে বিভিন্ন বিদ্যার ইতিহাস ও পুরাণের ঠাঁই হয়েছে— "সূত্র সাহিত্যেই প্রথম 'পুরাণ' নামক পৃথক শ্রেণীর সাহিত্য রচনার উল্লেখ থাকলেও বেদ ও উপনিষদসমূহে বিবিধ বিদ্যার তালিকায় ইতিহাস ও পুরাণের নাম অন্তর্ভুক্ত।"(বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৮: ৯৮) *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* গ্রন্থ থেকে জানা যায় *শতপথ ব্রাহ্মণ*-এ ইতিহাস, পুরাণ, গাথা, নারাশংসী শব্দগুলো একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে মূলত ইতিহাসের মৌল উপাদানরূপে। আবার *গোপথ ব্রাহ্মণ*-এ পুরাণকে চিহ্নিত করা হয়েছে পঞ্চম বেদ হিসেবে। অন্যদিকে, *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*-এ ইতিহাস ও পুরাণকে চার বেদের তুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত প্রণিধানযোগ্য—

> শতপথ ব্রাহ্মণে (১১/৫/৬৮) ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও নারাশংসী শব্দগুলির একত্র উল্লেখ থেকে অনুমিত হয় যে এগুলি প্রাচীন ইতিহাসের মৌল উপাদান ছিল। অথর্ববেদে চতুর্বেদের সঙ্গে পুরাণ নামটি উল্লিখিত। শতপথ ব্রাহ্মণে (৪/৩/১২-১৩) পরিপ্লবে ইতিহাস-বেদ ও পুরাণ-বেদ পাঠের উল্লেখ আছে। গোপথ ব্রাহ্মণে (১/১০) ভিন্নরূপে পঞ্চবেদের নাম উক্ত–সর্পবেদ, অসুরবেদ, পিশাচবেদ, ইতিহাস-বেদ ও পুরাণ- (৩/৪/১-২) ইতিহাস-পুরাণ পঞ্চম বেদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২/৪/১০) ইতিহাস ও পুরাণকে চার বেদের তুল্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৮: ৯৮)

ফলত বলা যায়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ধারায় পুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম। যা কিছু পুরাতন তাই পুরাণ—"পুরাতন তাই পুরাণ। পুরাণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ—পুরোনো কাহিনি" (বসু, ২০২৩: ২৪) অন্যদিকে, আভিধানিকভাবে *আধুনিক বাংলা অভিধান* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে পুরা+তন=পুরাণ। সেই সঙ্গে অর্থ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাচীনকাল থেকে পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কাহিনি কিংবা পুরাকালের সমাজ ধর্ম প্রভৃতি আশ্রয়ে রচিত আখ্যান। (চৌধুরী, ২০১৬: ৮৩৩) অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে প্রচলিত এবং প্রাচীনকালের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি আশ্রিত রচনালেখ্য হলো পুরাণ। আবার এ কথাও উল্লেখ আবশ্যক যে, 'পুরাণ' শব্দটি পুরা+তন (স্টন) যোগে (নিপাতনে 'ত' লোপ এবং 'ণত্ব' নির্দেশ) সৃষ্টি এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, 'পুরাণ' শব্দটি সংস্কৃত 'পুরাতন' থেকে প্রাকৃতে এসে 'পুরাঅণ' শব্দের মাধ্যমে 'পুরাণ' শব্দে পরিণত হয়েছে। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩৯: ১৯৮৫) তাই বলা যায়, যে গ্রন্থে দেব-দেবী, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, মানুষের জীবনাচরণ, ব্রহ্মানুসন্ধান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজাদের কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে এবং যার মাধ্যমে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার পরিজ্ঞান জন্মে তারই নাম পুরাণ। পুরাণ মূলত ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়।

একথা স্বীকার্য যে, পুরাণসমূহ ইতিহাস কিংবা রূপকথা নয় বরং পুরাণ-এর বিভিন্ন আখ্যান, উপাখ্যান থেকে তৎকালীন মানবজাতির সামষ্টিক আকাঙ্ক্ষার জীবনাচরণের প্রতিরূপ অনুসন্ধান করা যায় মাত্র। তদুপরি বলতে হয়, পুরাণের আবেদন বহু বিস্তৃত। পুরাণের আখ্যানসমূহ অতি সহজেই সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষের মনে অভিঘাত সৃষ্টি করে। তাদের কাছে পুরাণের অধিকাংশ চরিত্র দেবতা কিংবা দেবতার সমরূপ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তারা এসব কাহিনিকে সত্য বলেই মান্য করে। ফলে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত সনাতন ধর্মকে পুরাণভিত্তিক তথা পৌরাণিক ধর্ম বলা হয়ে থাকে। তাদের সর্ব প্রকার পূজা, অর্চনা সবই পুরাণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এমনকি আজও ভারতীয় জনসমাজে সামাজিক মূল্যবোধের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিশেষ আধার হয়ে আছে

পুরাণসমূহ। উল্লেখ্য, পুরাণের কাহিনিসমূহ অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপিত হলেও এর পরতে পরতে সূক্ষ্মভাবে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার বিবিধরূপ।

প্রবন্ধের মূল বিষয়ে আলোচনা শুরুর আগে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য প্রত্যয় 'বিনির্মাণ' সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বলে অনুমেয়। সংস্কৃত 'বি' উপসর্গযোগে (বি+নির্মাণ= বিনির্মাণ) 'বিনির্মাণ' শব্দটি গঠিত। এর অর্থ বিশেষরূপে নির্মাণ। 'বিনির্মাণ' শব্দটিকে বহু অর্থে প্রয়োগ করা যায়। এমনকি তত্ত্বরূপেও 'বিনির্মাণ'কে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধে 'বিনির্মাণ' প্রত্যয়টিকে পুনর্নির্মাণ, পুনসৃজন, নবনির্মাণ, নবীকরণ, ভাঙন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। কেননা জ্যাক দেরিদাকৃত 'ডিকনস্ট্রাকশন' তত্ত্বের সঙ্গে বক্ষ্যমাণ গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় অন্বেষণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'বিনির্মাণ' প্রত্যয়টি নিম্নোক্ত বক্তব্যের সারবত্তা হিসেবে গণ্য হতে পারে—

> আমরা আমাদের শিল্পের মাধ্যমে আমাদের কালকে ধরতে চাই, তার ডাকে সাড়া দিতে চাই। সেই সাড়া দেওয়ার ভাষাটা তো আজকের ভাষা হওয়া চাই। তাই শিল্পের ভাষার যুগে যুগে নবীকরণ ঘটে। এই সাড়া দেওয়া মনে মনে ঘটে না। সে সাড়া বাইরে প্রকাশ পায়। তাই বাইরের প্রকাশের ভাষাটা পালটে পালটে যায়। অপরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ভাষা তাই ক্রমান্বয়ে বদলে যায়। এই পালটে যাওয়া বা বদলে যাওয়াটা আমূল নয়-পুনর্ণবীকরণ [পুনর্নবীকরণ]। আর এই নবীকরণ ঘটে আমরা যে কালে বাঁচছি সেই কালকে বিধৃত করে। সেই কালকে মনে রেখে, আমাদের অবস্থান কোথায় তা স্মরণে রেখেই নবীকরণ। (রায়, ১৯৮৭: ১৪)

উল্লিখিত উদ্ধৃতির আলোকে বলা যায়, হাজার বছর ধরে প্রবহমান ঐতিহ্যবাহী নাট্য-আঙ্গিকের 'নবীকরণ'কেই এই প্রবন্ধে 'বিনির্মাণ' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করার প্রয়াস গৃহীত।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল আলোচনার প্রথমেই পুরাণে বিদ্যমান শকুন্তলা চরিত্রের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক বলেই বিবেচ্য। পুরাণ অনুসারে ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন শকুন্তলা। মহর্ষি কণ্ব তাঁর পালক পিতা। উল্লেখ্য, ঋষি বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য অপ্সরা মেনকাকে মর্তে প্রেরণ করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। মর্ত্যে এসে তপস্যারত বিশ্বামিত্রের সামনে গিয়ে মেনকা নানা ছলনা ও ক্রীড়াকৌতুকে মেতে ওঠেন। এক পর্যায়ে মেনকার সৌন্দর্য দেখে ঋষি বিশ্বামিত্র মুগ্ধ হন এবং মেনকার সঙ্গে মিলিত হন। কিছুদিন পরে মেনকা গর্ভবতী হন। বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা শকুন্তলার জন্ম

হয় হিমালয়ের পাদদেশে মালিনী নদীর তীরের সমভূমিতে—

> জনয়ামাস স মুনির্মেনকায়াং শকুন্তলাম্।
> প্রস্থে হিমবতো রম্যে মালিনীমভিতো নদীম্॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব, ২য় খণ্ড/৮৬/১০
> (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ১০০১)

> অর্থাৎ, হিমালয়ের পাদদেশের মালিনী নদীর তীরের সমভূমিতে শকুন্তলা নামের এক কন্যাসন্তান জন্ম দেন।

সদ্যপ্রসূত কন্যাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে দিয়ে মেনকা দেবরাজ সভার উদ্দেশে ফিরে চলে যান। সেসময় নবজাতকটিকে কিছু শকুন পরিবেষ্টন করে সুরক্ষিত রাখে। এদিকে কণ্ব মুনি নদীতে স্নান সেরে আশ্রমে যাওয়ার পথে শকুন পরিবেষ্টিত সদ্যজাত কন্যাটিকে দেখতে পেয়ে নিজ আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং পিতৃস্নেহে লালন-পালন শুরু করেন। নির্জন বনে শকুন্ত পাখির দ্বারা রক্ষিত হওয়ায় কণ্ব মুনি কন্যার নাম রাখেন শকুন্তলা—

> নির্জনে তু বনে যস্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিবারিতা।
> শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব, ২য় খণ্ড/৮৬/১৬
> (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ১০০২)

> অর্থাৎ, নির্জন বনে পাখি তথা শকুন্ত কন্যাটিকে রক্ষা করছিল বলে কণ্ব মুনি তাঁর নামকরণ করেন শকুন্তলা।

পুরাণ ও মহাকাব্যে শকুন্তলার এমনতর জন্মবৃত্তান্তই পাওয়া যায়। আরও জানা যায়, পুরুবংশীয় রাজা দুষ্মন্ত একবার তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। নানা বনে শিকার করতে করতে একসময় অনিন্দ্য সুন্দর এক বনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেই চমৎকার সুন্দর বনের পাশে মালিনী নদীর তীরে ছিল ঋষি কণ্ব মুনির আশ্রম। রাজা দুষ্মন্ত মহর্ষি কণ্বর সাথে দেখা করার জন্য আশ্রমে যান। সে সময় ফল সংগ্রহের জন্য কণ্ব মুনি আশ্রমের বাইরে থাকায় পিতার অনুপস্থিতিতে শকুন্তলা অতিথিকে আশ্রমের যথাযথ নিয়মে আদর-আপ্যায়ন করলেন। অপেক্ষারত দুষ্মন্ত একপর্যায়ে শকুন্তলার কাছে তাঁর বংশপরিচয় জানতে চান। ধারণা করা যায়, এই আশ্রম কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের সুপ্ত বাসনা থেকেই দুষ্মন্ত তাঁর পরিচয় জানতে চেয়েছেন। শকুন্তলা রাজাকে জানান যে, কণ্ব মুনির কাছে শুনেছেন তাঁর পিতা বিশ্বামিত্র আর মাতা মেনকা। লক্ষ করা যায়, জন্মসূত্রে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়ের সন্তান হওয়ার বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্মন্ত তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। শকুন্তলাও একজন স্বাভাবিক মানুষের মতোই জানান যে, পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি একা নিতে পারবেন না।

এদিকে সময় অতিবাহিত হতে থাকে আর রাজা দুষ্মন্ত একের পর এক যুক্তি দিয়ে শকুন্তলাকে রাজি করানোর প্রয়াস চালিয়ে যান। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিয়ের ধরন সম্পর্কে বলেন, এমনকি অলংকারসহ নানা উপহারের প্রলোভনও দেখান। তিনি একপর্যায়ে শকুন্তলাকে বলেন—

> আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ।
> আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্ত্তুমর্হসি ধর্ম্মতঃ ॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব, ২য় খণ্ড/৮৭/১৩
> (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ১০০৬)

অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের বন্ধু ও সহায়। ফলে ধর্মমতে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে দান করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত শকুন্তলা একটি শর্তে বিয়েতে রাজি হন। শর্তটি হলো, দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রকে চন্দ্রবংশের যুবরাজ হিসেবে রাজপদে অভিষিক্ত করতে হবে—

> সত্যং মে প্রতিজানীহি যথা বক্ষ্যাম্যহং রহঃ।
> ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেত্ত্বদনন্তরঃ ॥২২॥
> যুবরাজো মহারাজ! সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে।
> যদ্যেতদেবং দুষ্মন্ত! অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া ॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব, ২য় খণ্ড/৮৭/২২-২৩
> (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ১০০৮-১০০৯)

অর্থাৎ, এই নির্জন স্থানে আমি যা বলব আপনি সে বিষয়ে আমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করবেন, আমার গর্ভে আপনার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে সে আপনার জীবদ্দশায় যুবরাজ হবে এবং আপনার মৃত্যুর পর মহারাজ হবে। মহারাজ! এ যদি সত্যি হয় তাহলে আমিও আপনাকে সত্য বলছি যে, আপনার সাথে আমার সঙ্গম হোক।

অর্থাৎ, শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রই হবে চন্দ্রবংশের রাজা। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে সোনা-গহনার লোভ দেখিয়ে পেতে চেয়েছিলেন। আর অপরদিকে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে জয় করলেন মাতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তিনি রাজা দুষ্মন্তের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে তা কেবল নর-নারীর স্বাভাবিক প্রণয়ের আবেশে নয়; বরং ভবিষ্যৎ মা হিসেবে নিজের দাবি আদায়ের পর পরিণয় গ্রহণ করেন।

মহাভারত-এ উল্লেখ আছে, দুষ্মন্ত শকুন্তলার শর্ত শুনে কোনো বিচার বিবেচনা না করেই শর্ত মানবে বলে প্রতিজ্ঞা করলেন। অতঃপর গান্ধর্ব মতে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, শকুন্তলার পক্ষে উপরিউক্ত এই শর্তের প্রয়োজনীয়তা ছিল। কেননা, বিয়ের পরবর্তী সময়ে দুষ্মন্ত যে এই বিয়েকে ভুলে যাবেন না তার কোনো

নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ সেসময়ে যে রাজাদের বহুপত্নী গ্রহণের রীতি ছিল— সে বিষয়েও শকুন্তলা অবগত ছিলেন। ফলত তিনি রাজাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে রাজমহিষী হিসেবে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠা, নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি নির্জন বনে তাদের গান্ধর্ব মতে সম্পন্ন বিয়েকে সামাজিক স্বীকৃতির ধারায় সুরক্ষিত করেন। উল্লেখ্য, *মহাভারত*-এর অন্যান্য সংস্করণে পাওয়া শ্লোক থেকে জানা যায়, দুষ্মন্তের ঔরসে রাজমহিষী লক্ষণার গর্ভে জনমেজয় নামে এক পুত্র হয়, আর শকুন্তলার গর্ভে দুষ্মন্তের সর্বদমন বা ভরত নামে দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়।

পুরাণ এবং *মহাভারত* থেকে জানা যায়, গান্ধর্ব মতে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার কিছুদিন পর রাজা দুষ্মন্ত অল্পকাল পরে এসে শকুন্তলাকে নিয়ে যাবেন এই প্রতিজ্ঞা করে রাজধানীতে ফিরে যান। এদিকে সহজ সরলমতি শকুন্তলা রাজাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছিল— যা তাঁর আচার আচরণেই প্রকাশ পায়। বলা যায়, সরল মনে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তর সকল প্রতিজ্ঞা-আশ্বাসকে বিশ্বাস করেছিলেন। এর কিছুদিন পর শকুন্তলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এক সুদর্শন পুত্র। শৈশবেই এই সুদর্শন ও শক্তিশালী পুত্র সকল প্রাণীকে দমন করতে পারত বলে তার নাম রাখা হয় সর্বদমন। কিছুকাল পরে সর্বদমনের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার সময় হলে কণ্ব মুনি তাঁর শিষ্যদের তত্ত্বাবধানে শকুন্তলা ও সর্বদমনকে দুষ্মন্তের রাজধানীতে প্রেরণ করেন।

দুষ্মন্তের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের পুত্রকে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করার কথা জানান। কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলা ও তাঁর পুত্রকে অস্বীকার করেন, যদিও রাজার স্মৃতিতে সকল বিষয়ই স্মরণ ছিল। সেইসাথে রাজা দুষ্মন্ত কঠোর ভাষায় অপমান করেন। রাজসভায় অপমানিত শকুন্তলা সভার মধ্যেই নিজের জন্মকথা, দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর গান্ধর্ববিবাহ এবং পুত্র সর্বদমনের জন্মের কাহিনি বিবৃত করেন। লক্ষণীয়, একজন সম্মানিত নারীর পক্ষে নিজের জীবনের এইসব একান্ত ব্যক্তিগত কথা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বর্ণনা করা কখনোই সমীচীন ছিল না। কিন্তু রাজসভায় অপমানিত শকুন্তলার কাছে নিজের এবং পুত্রের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কাহিনি বয়ান ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। কারণ নিজের এবং পুত্রের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করতে হলে তাঁকে যে দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করতেই হবে— একথা শকুন্তলা স্পষ্টত বুঝে গিয়েছিল। শকুন্তলার এই প্রতিবাদ নিজের অধিক যে পুত্রের সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল, এ কথাও তিনি রাজসভায় দৃঢ়তার সাথেই ঘোষণা করেছেন—

> কামং ত্বয়া পরিত্যক্তা গমিষ্যামি স্বমাশ্রমম্।
> ইমন্তু বালং সংত্যক্তুং নার্হস্যাত্মজমাত্মনা ॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব, ২য় খণ্ড/৮৮/৭২
> (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ১০২৯)

> অর্থাৎ, শকুন্তলা বলেছেন দুষ্মন্ত তাঁকে স্বীকৃতি না দিলে তিনি আশ্রমে ফিরে যাবেন। কিন্তু রাজাকে তাঁর ঔরসজাত পুত্রকে গ্রহণ করতেই হবে।

দেবতাগণ দৈববাণীর মাধ্যমে রাজা দুষ্মন্তকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, মাতা পুত্রের আধার মাত্র, পুত্রের প্রকৃত অধিকারী পিতা। কারণ পিতাই পুত্রের মধ্য দিয়ে আবার জন্ম নেন। সুতরাং পুত্রকে ভরণ-পোষণের ভার দুষ্মন্তকেই নিতে হবে। যেহেতু দেবগণের অনুরোধে দুষ্মন্ত বালকটির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবেন, তাই শিশুটির নাম হবে ভরত–"তস্মাদ্ভবত্বয়ং নাম্না ভরতো নাম তে সূতঃ।" (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ১০৩৮) দৈববাণী শুনে শকুন্তলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন রাজা দুষ্মন্ত। একই সাথে সর্বদমনকে নিজপুত্ররূপে স্বীকৃতি দেন। এ সময় তিনি শকুন্তলাকে জানান—

> অব্রবীচ্চৈব তাং রাজা সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ।
> কৃতো লোকপরোক্ষোহয়ং সম্বন্ধো বৈ ত্বয়া সহ ॥
> তস্মাদেতন্ময়া দেবি! ত্বচ্ছদ্ধ্যর্থং বিচারিতম্ ।
> মন্যতে চৈব লোকস্তে স্ত্রীভাবান্ময়ি সঙ্গতম্ ॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব, ২য় খণ্ড/৮৮/১২২-১২৩
> (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ১০৪০- ১০৪১)

> অর্থাৎ, দেবি! আমি লোকের অসমক্ষে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলাম। সেই জন্যই বিশেষ বিবেচনা করে আমি তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য এরূপ ব্যবহার করেছি।

তিনি ইচ্ছা করেই শকুন্তলাকে না চেনার ভান করেন। কারণ তাঁদের সম্পর্ক বা বিয়ে হয়েছিল নির্জন তপোবনে, রাজধানীর লোকচক্ষুর আড়ালে। তাই তিনি চেয়েছিলেন শকুন্তলা জনসম্মুখে যুক্তি দ্বারা নিজেই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক। তা না হলে এই সমাজ-সংসারের লোকেরা হয়তোবা শকুন্তলাকে চরিত্র দোষে দুষ্ট বলে মনে করত। এজন্যেই তিনি চেয়েছেন শকুন্তলা নিজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক। *বায়ু পুরাণ*-এর চতুর্থ অধ্যায়ের ১-১৩ নং শ্লোক (তর্করত্ন, ২০০২:১৯), *বিষ্ণুপুরাণ* (তর্করত্ন, ২০১০:৮২)-এর চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ নম্বর শ্লোকেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, শকুন্তলার উল্লেখ *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ*, *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ*-এ পাওয়া যায়। *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও* শকুন্তলার জন্ম এবং ঋষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার কন্যা হিসেবে তাঁর বেড়ে ওঠার কাহিনি রয়েছে। বিষ্ণু পুরাণে আছে, দুষ্মন্তের সাথে তাঁর প্রেম এবং ভুল বোঝাবুঝির কাহিনি, যেখানে তাঁর সন্তান ভরত পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের নামকরণের উৎস হন। *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে* আছে, শকুন্তলার ধৈর্য ও সতীত্বের প্রশংসাসূচক বিষয়াদি। এখানে শকুন্তলা এক পরমাসুন্দরী, দয়ালু, দৃঢ়চেতা নারীরূপে চিত্রিত হন। তাঁর প্রেম, দুষ্মন্তর সাথে বিয়ে ও ভুল বোঝাবুঝির আখ্যানে মায়ের আদর্শরূপ প্রতিফলিত হয়।

শকুন্তলা সেই যুগের এক নারী চরিত্র—যিনি একাধারে মা ও স্বাধীন নারীত্বের প্রতিচ্ছায়া। প্রকৃতির নিবিড় সংশ্লিষ্টতায় বেড়ে ওঠা শকুন্তলা প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যা নারীর সহজাত শক্তি ও সহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও ব্রহ্ম পুরাণে যে নারীর শুদ্ধতা ও ধৈর্যের কথা উঠে আসে, শকুন্তলা সেই চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। তাঁর জীবনের প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে নিজের সন্তান ভরতকে লালন-পালন করার মাধ্যমে তিনি সমাজে নারীর শক্তিশালী অবস্থানের উদাহরণ হয়ে ওঠেন।

উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণ শেষে বলা যায়, পৌরাণিক শকুন্তলা চরিত্রটি সরলতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দৃঢ় আত্মসম্মানবোধের এক অসামান্য প্রতিফলন। ঋষি কণ্বের আশ্রমে লালিত শকুন্তলা প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা একজন নির্ভীক এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব, যিনি ভালোবাসা ও মমত্বের গভীর অনুভূতিকে ধারণ করেন। দুষ্মন্তের সঙ্গে তাঁর গান্ধর্ববিবাহ এবং পরবর্তীসময়ে রাজসভায় অস্বীকৃত হওয়ার ঘটনাগুলো শকুন্তলার চরিত্রের দৃঢ়তা ও আত্মসম্মানকে প্রকাশ করে। *মহাভারত*–এ দেখা যায়, রাজা দুষ্মন্ত যখন তাঁকে অস্বীকার করেন, তখন শকুন্তলা নির্ভীকভাবে তাঁর সততা ও মর্যাদার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন। তাঁর এই আত্মমর্যাদাবোধ একজন নারীর সাহস এবং নিজ অধিকার রক্ষার অঙ্গীকারের প্রতীক। শকুন্তলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাঁর মাতৃত্ব। তিনি একা তাঁর পুত্র ভরতকে মানুষ করেন, যিনি পরে ভারতবর্ষের মহান শাসক হিসেবে খ্যাত হন। এ থেকে বোঝা যায় যে, শকুন্তলা কেবল একটি রোমান্টিক বা নাট্যধর্মী চরিত্র নন; তিনি একাধারে মাতৃত্বের দৃঢ়তা ও সামাজিক দায়িত্বের প্রতিচ্ছবি।

বলা যায়, পৌরাণিক শকুন্তলা চরিত্র নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও কোমলতা যেমন বহন করে, তেমনই সংকটময় পরিস্থিতিতে দৃঢ়তা ও আত্মসম্মানের প্রতীরূপ হয়ে ওঠে। তাঁর জীবন কাহিনি নারীর মর্যাদা ও শক্তির উদাহরণ, যা আজও নারীদের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং প্রেরণাদায়ক। পুরাণের শকুন্তলা কেবল প্রেমের উপাখ্যানের প্রণয়িনী নন, বরং এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সরলমতি নারীর আত্মপরিচয়ের রূপক।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক নাট্যকার নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন এর রচনায় পুরাণ কাহিনির উল্লিখিত শকুন্তলা চরিত্রটিই এক ভিন্নতর চেতনায় নবকালের মানসজাত হয়ে সৃজিত। ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে আশ্রমিক কন্যা শকুন্তলা। *মহাভারত*েের আদি পর্বে এই আশ্রমিক কন্যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ ছাড়াও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কালিদাস প্রণীত *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর মধ্যে শকুন্তলার দৃঢ় অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। বলা যায়, কালিদাসকৃত নাট্যচরিত্র শকুন্তলার পরিচিতি বিশ্বখ্যাত। কেননা, কালিদাসের নাট্যচরিত্র শকুন্তলাই দেশ-বিদেশের সাহিত্যে অধিক চর্চিত হয়েছে।

উনিশ ও বিশ শতকের কলকাতার নাট্যচর্চায় কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের অনূদিত রূপেও মঞ্চায়ন হলেও এই বিষয়কে আশ্রয়পূর্বক অপরেশ মুখোপাধ্যায় ব্যতীত অন্য কোনো নাট্যকারের রচনা পাওয়া যায় না। এছাড়া বিশ শতকের স্বাধীন বাংলাদেশে নাট্যকার সেলিম আল দীন শকুন্তলার উপাখ্যানকে নিয়ে রচনা করেন নাটক *শকুন্তলা*। লক্ষ করা যায়, সেলিম আল দীন এর রচনায় এক ভিন্নতর চেতনায় সৃজিত হয় শকুন্তলা চরিত্রটি। তন্মধ্যে *মহাভারত*, কালিদাস এবং অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের নাটকের শকুন্তলা প্রেম ও আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি হলেও সেলিম আল দীনের শকুন্তলা হয়ে ওঠে আত্মসম্মান ও প্রতিবাদের প্রতীক স্বরূপ।

উল্লেখযোগ্য, উনিশ শতকের নাট্যধারায় শকুন্তলা অবহেলিত থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের গল্পে ও প্রবন্ধে শকুন্তলার প্রসঙ্গ স্থান পায়। কিন্তু মৌলিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে সেলিম আল দীন-ই অগ্রবর্তী। এমনকি সেলিম আল দীন পৌরাণিক শকুন্তলা উপাখ্যানকে আশ্রয়পূর্বক কোনো পৌরাণিক নাটক রচনা করতেও প্রয়াসী ছিলেন না। ফলত তাঁর *শকুন্তলা* নাটকটি আধুনিক কালের নাটকরূপেই বিবেচ্য। কিংবা বলা যায়, পৌরাণিক বিষয় ও চরিত্রসমূহের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও *শকুন্তলা* পৌরাণিক নাটক নয়। বরং আধুনিক কালের নাট্যকারের স্বকীয় চেতনায় বিকশিত সেলিম আল দীন এর *শকুন্তলা*। কিংবা বলা যায়, *শকুন্তলা* রচনায় সেলিম আল দীন এর অভিপ্রায় ছিল ভারতীয় পুরাণের বিনির্মাণ ও সম্প্রসারণের বাসনা। ফলত ঢাকা থিয়েটারের শকুন্তলা প্রযোজনার প্রচার পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল—

> কবিগুরু গ্যেটের জীবনে শকুন্তলা এনেছিলো আলোড়ন। শকুন্তলার প্রশস্তিতে লেখা একটি অবিস্মরণীয় কবিতাও আছে গ্যেটের। যাতে তিনি মর্ত্যের ও স্বর্গের একীভূত এক অত্যাশ্চর্য রূপ দেখেছিলেন।
>
> কিন্তু স্বর্গ ও মর্ত্যের মিলনের দৃষ্টান্ত শকুন্তলা কীভাবে হতে পারে? যাঁর জন্ম বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গে, স্বর্গ ও মর্ত্যের বিরোধে, তাঁর জীবন দ্বন্দ্বহীন গল্প হয় কী করে? কালিদাস আর গ্যেটে শকুন্তলার মধ্যে কেবলই সৌন্দর্য আর মিলনই দেখেছেন, বিরোধকে নয়; আমরা এই বিরোধকে প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের শকুন্তলা এই বিরোধ প্রত্যক্ষকরণের ফল। (বালা, ২০১৫:২৬২)

লক্ষণীয়, সেলিম আল দীন স্বর্গ ও মর্ত্যের দ্বন্দ্ব বা বিরোধকে নির্মাণ করতে চাইলেন বৃহৎ পরিসরে। ফলে ঋষি বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গে কেবল দেবরাজ ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রই তুলে আনলেন না— তিনি দেখালেন স্বর্গের অপ্সরী মেনকার গর্ভের সন্তান শকুন্তলার অন্তর্দ্বন্দ্বকে; যেখানে মানবের ঔরসে জন্ম নিয়েও নিদারুণ প্রীতি তার স্বর্গের প্রতি! এখানেই সেলিম আল দীন শকুন্তলা চরিত্র সৃজনে *মহাভারত*,

কালিদাস কিংবা অপরেশ মুখোপাধ্যায় থেকে স্বতন্ত্ররূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। কেননা, *মহাভারত* রচয়িতা এবং *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর রচয়িতাগণ শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত, দেবরাজ ইন্দ্রের ষড়যন্ত্র এবং শকুন্তলার প্রণয়-বিবাহ ও সন্তানের অধিকার আদায়ের যে চিত্র রচনা করেন— তার বিপরীতে সেলিম আল দীন স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের ষড়যন্ত্রকে প্রাধান্য দিলেও শকুন্তলার প্রেম-বিয়ে-সন্তান লাভের কাহিনিকে ত্যাগ করলেন। বরং তিনি কিশোরী শকুন্তলার মানব জন্মের প্রতি ভয়ংকর ঘৃণা ও দ্বন্দ্বকে তুলে ধরলেন নাট্য পরিক্রমায়। ফলে সেলিম আল দীনের *শকুন্তলা* নাটকে রাজা দুষ্মন্তর কোনোরূপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি পাওয়া যায় না। অথচ মহাভারত কিংবা কালিদাস ও অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের শকুন্তলার উপাখ্যান শুরুই হয় রাজা দুষ্মন্তর বীরত্বসূচক জয় এবং পুত্রদের কথা বলে। তন্মধ্যে *মহাভারত*-এ আছে—

> দুষ্মন্তং শূরভীমৌ চ প্রবসুং বসুমেব চ।
> তেষাং শ্রেষ্ঠোহভবদ্রাজা দুষ্মন্তো দুর্জয়ো যুধি ॥
> দুষ্মন্তাল্লক্ষণায়ান্ত জজ্ঞে বৈ জনমেজয়ঃ।
> শকুন্তলায়াং ভরতো দৌষ্মনিরভবৎ সুতঃ।
> তস্মাদ্ভর তবংশস্য বিপ্রতস্থে মহদযশঃ ॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব, ২য় খণ্ড/৮১/১৮-১৯
> (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ৯৬৬-৯৬৭)

অর্থাৎ, দুষ্মন্ত যুদ্ধজয়ে দুর্জয় ছিলেন এবং রাজা হয়েছিলেন। তারই ঔরসে লক্ষ্মণার গর্ভে জনমেয় নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেছিল এবং শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে অপর এক পুত্র জন্মলাভ করেছিল। এই ভরতই ভরতবংশের যশ বিস্তারিত করেছিল।

সেলিম আল দীন রচিত নাটকটিতে শকুন্তলার এমনতর প্রসঙ্গ কিংবা দুষ্মন্ত-ভরত কারো কোনো প্রসঙ্গের স্থান লাভ ঘটে নাই। বরং তিনি *শকুন্তলা* নাটকে যৌবন উন্মেষ এক কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, দ্বন্দ্বের চিত্রকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পান। লক্ষণীয়, সেলিম আল দীন প্রণীত *শকুন্তলা* নাটকটি দুইটি অংশে বিস্তৃ ত। যথা– ক. স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র খণ্ড। খ. শকুন্তলা খণ্ড, এই দুই শিরোনামে ঘটনা ক্রমের বিকাশ ঘটে।

সেলিম আল দীন প্রণীত *শকুন্তলা* নাটকটি পাঠ করলে এর গড়নে যেমন সংস্কৃত নাট্যাঙ্গিকের প্রভাব অনুধাবন করা যায়, তদ্রুপ কাহিনির ক্ষেত্রেও আপাতভাবে কালিদাস প্রণীত *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। সেলিম আল দীন কৃত *শকুন্তলা* নাটকের স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র খণ্ডটি *মহাভারতের* অনুরূপ কাহিনি আশ্রয়েই বিকশিত। *মহাভারতে* রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার মুখ দেখে তাঁর জন্মকাহিনি জানতে গিয়ে স্বর্গীয় ষড়যন্ত্রের ঘটনাটি প্রকাশিত হয়। যথা—

> যথায়মাগমো মহ্যং যথা চেদমভূৎ পুরা।
> শৃনু রাজন্! যথাতত্ত্বং যথাস্মি দুহিতা মুনে ॥
> ঋষিঃ কশ্চিদিহাগম্য মম জন্মাভ্যচোদয়ৎ।
> তস্মৈ প্রোবাচ ভগবান্ যথা তচ্ছৃণ পার্থিব ॥ *মহাভারত*, আদিপর্ব, ৮৫/১৮-১৯
> (ভট্টাচার্য্য, ১৪২২: ৯৯২)

> অর্থাৎ, মহারাজ, আমি কেমন করে কণ্বমুনির কন্যা হয়েছি সে সম্পর্কে যা আমার জানা আছে তা যথাযথভাবে আমার কাছ থেকে শুনুন। একদা এক ঋষি এই আশ্রমে এসে আমার জন্মের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে কণ্ব যা বলেছিলেন— মহারাজ! তা আপনি শ্রবণ করুন।

অন্যদিকে, সেলিম আল দীনের নাটকের শুরু সংস্কৃত নাট্যাঙ্গিকের ধারাবাহিকতায়। ফলত সূত্রধারই এই অংশের সূত্র ধরিয়ে দেন। নাটকের শুরুতেই সূত্রধার বলেন—

> সুধীমণ্ডলি–আজ এই রঙ্গভূমিতে দৃশ্যকাব্য শকুন্তলার অভিনয় হবে। দৃশ্যকাব্যটি স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র ও শকুন্তলা-এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। [...]
>
> একদিন সন্ধ্যাবেলা অর্কের উপর ধূপ জ্বালাবার দায়িত্ব পড়ে। বিশ্বামিত্র সে সময় গূঢ় মন্ত্রোচ্চারণে ব্যস্ত। তখন ধোঁয়ার আড়ালে অর্ক সতর্ক হাতে তাঁর চোখে তীক্ষ্ণমুখ ধূপকণা নিক্ষেপ করে। ঋষির চোখে সৃষ্টি হয় তীব্র প্রদাহ।... ওইতো অর্ক আসছে– (আল দীন, ১৯৮৬: ৪৯-৫০)

লক্ষণীয়, সেলিম আল দীনের *শকুন্তলা* নাটকে ধৃত স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র খণ্ডে ঋষি বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে দেবরাজ ইন্দ্রের ষড়যন্ত্র এবং মেনকার সঙ্গে বিশ্বামিত্রের মিলন ও শকুন্তলার জন্ম স্বল্প পরিসরে বিবৃত হয়। যেখানে অর্ক, লৌহিত, মহাভিষ, তক্ষক, পত্রলেখা, ইন্দ্রলেখা, উতঙ্ক প্রমুখ চরিত্রের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোনোভাবেই পাওয়া যায় না। যদিও মেনকাই যোজনগন্ধা নামে *শকুন্তলা*য় স্থান পায়। অধিকন্তু, শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কিত ঘটনাটি *মহাভারত*তের এই স্বল্প বিস্তৃত বয়ানেরই বৃহৎ এক রূপ। অন্যদিকে নাটকের 'শকুন্তলা খণ্ড'তে কণ্বমুনি ও গৌতমীর কাছে নিজের জন্মবৃত্তান্ত শোনা সদ্য যৌবনবতী শকুন্তলার ঘটনাটুকুর আভাসই কেবল *মহাভারতে* বিদ্যমান। ফলে শকুন্তলা *মহাভারতে* পূর্বশ্রুত জন্মবৃত্তান্তটুকুই রাজা দুষ্মন্তকে জানিয়েছিল। অন্যদিকে পালিত পিতা কণ্বমুনি ও গৌতমীর কাছে নিজের জন্মবৃত্তান্ত শুনে শকুন্তলার কীরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সে-বিষয়ে *মহাভারতের* রচয়িতা কিংবা কালিদাস ও অপরেশ মুখোপাধ্যায় দৃষ্টি না দিলেও নাট্যকার সেলিম আল দীন শকুন্তলা খণ্ডে তা-ই নিরূপণ করার প্রয়াস চালান; আধুনিক মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার আলোকে নবতর ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে। ফলে, *শকুন্তলা* নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডে দৃঢ়ভাবে উপস্থিত নিদারুণ শকুন্তলার মনোযন্ত্রণা ও কষ্ট *মহাভারতে*-সহ কোনো রচনাতেই দৃষ্ট হয় না।

শকুন্তলা নামক খণ্ডটির শুরু শকুন্তলার জন্মের মধ্য দিয়ে। যেখানে শকুন্তলাকে প্রসব করেই মেনকা তথা যোজনগন্ধা তাকে মালিনী নদীর তীরে ফেলে স্বর্গে চলে যায়। সেখান থেকেই সূত্রধারের বয়ানের মাধ্যমে নাট্যঘটনা শুরু হয়। লক্ষযোগ্য, উক্ত খণ্ডের প্রথমার্ধেই *মহাভারতের* বিপরীত এক রূপ সৃষ্টির প্রয়াস পান নাট্যকার সেলিম আল দীন। বিশেষত *মহাভারত* ও *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, *শকুন্তলা*য় যেখানে হরিণ শিকার করতে এসে রাজা দুষ্মন্ত আশ্রমে প্রবেশ করে, সেখানে সেলিম আল দীনের *শকুন্তলা* নাটকে আছে চণ্ডাল কর্তৃক আশ্রমের হরিণকে হত্যা করা হয়। এখান থেকেই যেন সেলিম আল দীন ভিন্নভাবে শকুন্তলার বয়ান উপস্থাপনে ব্যাপৃত হন। বলা বাহুল্য, সেলিম আল দীন রচিত *শকুন্তলা* মহাভারতের অধিক *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* দ্বারা প্রভাবিত। ফলত, এমনও বলা অযৌক্তিক হবে না যে, চণ্ডালরূপী ধনুর্ধর বেশে সেলিম আল দীন মূলত রাজা দুষ্মন্তকেই উপস্থাপন করেছেন। কেননা, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাট্যঘটনায় শকুন্তলার মানসিক পীড়ন, যন্ত্রণা ও কষ্ট শুরু হয়েছিল দুষ্মন্তর সাথে গান্ধর্ব বিয়ে হওয়ার পর থেকে। এমনকি সন্তানের পিতৃত্বের অধিকার আদায়ের জন্য শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের রাজসভায় গমন করে তখন রাজা দুষ্মন্তকে ‘অনার্য’ বলেও কটুবাক্য উচ্চারণ করেছিল শকুন্তলা। এখানে অনার্য-এর সমরূপেই চণ্ডাল বিবেচ্য। কেননা আর্য সমাজে অনার্যরূপে বিবেচিত ছিল তৎকালীন সমাজের চতুর্বর্ণপ্রথায় থাকা শূদ্র শ্রেণির চণ্ডালগণও। ফলত, রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার সঙ্গে গান্ধর্ব বিয়ে এবং স্বীয় ঔরসের সন্তানকে প্রকাশ্য রাজসভায় অস্বীকার করার মতো ঘটনাকে নাট্যকার সেলিম আল দীন চণ্ডালদের মতোই আচরণরূপে বিবেচনা করতে পারেন—এমন ধারণা অনাবশ্যক নয়।

নাট্যঘটনায় লক্ষ করা যায়, যৌবনবতী শকুন্তলার ঋতুচক্রের রক্তপ্রবাহ ক্রমেই তাকে দুর্বল করে দেয়। মস্তিষ্কে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে। মানবজীবনের সঙ্গে জড়িত নাড়িভুঁড়ি-শ্লেষ্মা-বমি তাকে অস্থির করে তোলে। প্রচণ্ড ঘৃণায় সে মানব জীবন থেকে মুক্তি পেতে চায়। এদিকে চণ্ডালেরা আশ্রমে পালিত হরিণ শাবককে হত্যা করে নাড়িভুঁড়ি রক্ত বের করে চলে যায়। শকুন্তলা সেই হরিণ শাবককে খুঁজতে গিয়ে মৃত হরিণ শাবকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শকুন্তলা বলেন—

> আমি দেখে ফেলেছি, হরিণের নাড়ি-ভুঁড়ি-নিত্বক– হাড়-মাংস। আমি দেখে ফেলেছি। কারা যেন আজ ভোরে চিত্রালি চামড়ার বসন খুলে নিয়ে গেছে।... ছিন্ন মাথা, বাঁকা শিঙ। চোখের কোণায় কষ্টের নোনাজল শুকিয়ে গেছে। [...]
>
> এই কষ্ট এই ক্লেদ! ও চাঁদ- শোন আমার অন্ত্রভরা গোপন অসুখ! এত যে অমল হরিণ তবু তার চামড়ার নিচে এত বমি ... এত বমি জমা ছিল! (আল দীন, ১৯৮৬: ৭৭- ৮২)

উল্লিখিত সংলাপাংশে হরিণের দেহের অভ্যন্তর দিয়ে শকুন্তলা নিজের শরীর বৃত্তীয় বিষয়াদির চিন্তনই ব্যক্ত করে। ফলত কণ্বমুনি ও গৌতমীর মুখে নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানতে পারলে মানবজন্মের প্রতি তার তৈরি হয় তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার। তাই তো সে বলে—

> কি চাই আমি? আমি চাই মেনকার কন্যার উদরে নেই পুঁতিগন্ধ, মুখ ভরে ওঠে না কৃমিকীটে। সোনালী চাঁপার গন্ধ ফুরোবার আগে আমি চলে যেতে চাই ওই নক্ষত্রের দেশে! আমি চাই এই বৃদ্ধাটি চলে যাক এখান থেকে। মায়ের মিথ্যে পরিচয় দিয়ে সে আমাকে স্বর্গে যেতে দেয়নি। তার চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে, মৃত্যু এসে পাঁচ আঙুলে নাড়ে তাকে দৈনিক। তাকে ঘেন্না করি আমি। (আল দীন, ১৯৮৬: ৯১)

উপর্যুক্ত সংলাপে এক বিদ্রোহী শকুন্তলার আবির্ভাব যেমন ঘটে তেমনি মর্ত্যের মানুষ ও স্বর্গের দেবতা কিংবা অপ্সরীর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিফলনও ঘটে। আর ঋতুমতী শকুন্তলার অভ্যন্তর দিয়ে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বকেই উদ্ভাসিত করেন নাট্যকার সেলিম আল দীন; যা *মহাভারত* রচয়িতা কিংবা কালিদাস ও অপরেশ মুখোপাধ্যায় অনুভব করার প্রয়াস পাননি।

লক্ষ করা যায়, নিজের জন্মবৃত্তান্ত তথা অস্বাভাবিক জন্মকথা এবং মর্ত্য মানবের নশ্বরতা, অসম্পূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, রোগ-শোক-জ্বরা-ব্যাধি, এমনকি হিংস্রতা সম্পর্কে জানার পর শকুন্তলার ভেতর মানুষের প্রতি শুরু হয় তীব্র ঘৃণা। সেই ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে নিম্নের সংলাপে—

> মা বলেছেন শুদ্ধ হও মেয়ে। এই সব নোংরা নাড়িভুঁড়ি ফেলে চলে এসো। মা আমি আজ ধূপ জ্বালাব, পায়ে পরব সোনার নূপুর। মানুষ, মানুষ। ছিঃ ঘেন্না! তারা এক পেট বমি নিয়ে স্বর্গের গান করে। আমি এই নখে কুয়াশা মেখে সাঁঝের আকাশ দেখব। আমার নাচে নদী চলে আসবে ভুল পথে। হাতের মুদ্রার ইঙ্গিতে ফেটে যাবে শিমুল বৃক্ষের ফল। আমি ওই আকাশ-কন্যা। এই বিকাল বেলার ওই তারাটির মতো। দূরের আকাশ আমাকে দিয়েছে নীল ঘামাচি; তুমি দিয়েছ সোনালী চাঁপার গন্ধ। তোমারো সুগন্ধ ছিল মা, তুমি ছিলে যোজনগন্ধা। এখানে কেবলি শীত, কেবলি রক্ত। মলমূত্রে ভেসে যায় নাচের সভা। এখানে আমি কি একলা, বেঁচে আছি। মাগো চারদিকে সবকিছু মরে যাচ্ছে। নীল অভ্রের ডানা দাও। মা দাও দাও। (আল দীন, ১৯৮৬: ৯০-৯১)

উক্ত সংলাপে শকুন্তলার মানব জীবনের প্রতি ঘৃণার সাথে সাথে শূন্যহৃদয়ের আর্তি ও একাকিত্বের যন্ত্রণার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। একে বলা চলে— “আধুনিক জীবনবোধ সম্পন্ন মানুষ অনুরূপ অতল শূন্যতায় নিমজ্জিত।”(রহমান, ২০১০: ৬৩)

সেলিম আল দীনের শকুন্তলা মানব জীবনকেই অস্বীকার করে। তার এই ঘৃণার পেছনে সক্রিয় থাকে মানুষের পচনশীল শরীর। অথচ নিজের অস্বাভাবিক জন্ম কিংবা জীবন সম্পর্কে *মহাভারত* ও *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এ শকুন্তলার এরূপ দ্রোহী মনোভাবের ক্ষীণরূপও প্রতিফলিত নয়। তাই বলা যায়, সেলিম আল দীনের শকুন্তলা চরিত্রটি নাট্যকারের আধুনিক ও স্বকীয় চেতনায় বিস্তার লাভকারী এক নারী। যে নারী মর্ত্যে মানব ও স্বর্গের নারীর মিলনের ফল। অধিকন্তু, সে স্বর্গের ষড়যন্ত্রের ফসল। ফলত সেলিম আল দীনের শকুন্তলার স্বর্গপ্রীতি কিংবা মানুষের জীবনের প্রতি ঘৃণার মধ্যেও লুক্কায়িত থাকে স্বর্গ-মর্ত্যের দ্বান্দ্বিক বাস্তবতা। এই দ্বান্দ্বিক বাস্তবতাকে নির্মাণের প্রয়াসেই সেলিম আল দীন পুরাণকে তথা পুরাণের শকুন্তলাকে ভেঙে নবনির্মাণ তথা বিনির্মাণ করেছেন। ফলে তাঁর *শকুন্তলা* নাটকটি পৌরাণিক নাট্য অভিধার পরিবর্তে শকুন্তলার বিনির্মাণরূপেই অধিকভাবে গৃহীত হয়। এই নবনির্মাণের মূল কেন্দ্র শকুন্তলা। অর্থাৎ সেলিম আল দীনের শকুন্তলা চরিত্রটি বাংলা নাট্যধারায় বিনির্মিত এক প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনার দাবিদার। সমালোচকের ভাষায়—

> অপরদিকে সেলিম আল দীন শকুন্তলাকে একজন প্রতিবাদী নারী হিসেবে রূপায়িত করেছেন। কালিদাসের শকুন্তলার মতো তিনি তাঁর শকুন্তলাকে শান্ত-সৌম্য মোহিনীরূপে চিত্রিত করেননি। শকুন্তলা যখন জানতে পারলেন তাঁর মা মেনকা তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছেন, তখন তাঁর পালিতা মা গৌতমীকে উদ্দেশ্য করে বললেন: ‘মেরে ফেল নি কেন আমাকে। মাতৃস্নেহে মানুষ করেছ-মাতৃস্নেহে তুমি আমাকে মেরে ফেল নি কেন সেই দিন’ ইত্যাদি। তাঁর এই স্পষ্টবাদিতা ও প্রতিবাদী আচরণের মধ্য দিয়ে সেলিম আল দীন যেন তাঁকে এই সমাজেরই একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। (তালুকদার, ২০১৪: ৩২১)

প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থ এবং নাটকীয় রচনাগুলোর মধ্যে পৌরাণিক নারীদের যে গভীর, স্থায়ী এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ছিল, সেটি অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক বাংলা নাটকে পুনরায় উঠে এসেছে। তবে, এখানে মূল প্রভাব ছিল সামাজিক বাস্তবতা, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং নাট্যকারদের স্বকীয় চিন্তাভাবনা। বাংলা নাটকে পুরাণের কাহিনি এবং নারী চরিত্রের এই পুনর্নির্মাণে নাট্যকারের ভাষা, নাট্যরীতি এবং উপস্থাপনার কৌশলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেলিম আল দিনের *শকুন্তলা* নাটকে পৌরাণিক নারীর মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এই নাটক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় নারী চরিত্রের পুনর্নির্মাণের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এক কথায়, পৌরাণিক নারী চরিত্রগুলোর বাংলা নাটকে বিবর্তন এবং পুনর্নির্মাণ অধিকাংশক্ষেত্রে নারীর সামাজিক অবস্থা,

সাংস্কৃতিক চেতনা এবং আধুনিক চিন্তাধারার প্রতিফলন। এসব চরিত্রের মাধ্যমে বাংলা নাটক যে সমসাময়িক মূল্যবোধ ও নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করেছে, তা নিদ্বির্ধ উল্লেখযোগ্য।

পুরাণ এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে শকুন্তলা চরিত্রটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মাতৃত্ব ও সতীত্বের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। কালিদাস রচিত *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে শকুন্তলা রোমান্টিক প্রেম এবং সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি হলেও, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক প্রতিবাদের বিষয়টি সরাসরি ফুটে ওঠেনি। উনিশ শতকের সাহিত্যিকদের গল্প ও প্রবন্ধে শকুন্তলার উল্লেখ থাকলেও, মৌলিক নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি অবহেলিত ছিলেন। বাংলাদেশের নাট্যকার সেলিম আল দীন তাঁর *শকুন্তলা* নাটকে শকুন্তলাকে এক স্বাধীন, প্রতিবাদী, দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং স্বকীয় নারী চরিত্র হিসেবে পুনর্নির্মাণ করেছেন। শকুন্তলার জন্ম, স্বর্গীয় ষড়যন্ত্র, মানব জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা এবং স্বকেন্দ্রিক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব উক্ত নাটকে আধুনিক ও সামাজিক বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত হয়েছে। সেলিম আল দীন *মহাভারত* এবং কালিদাসের কাহিনিকে আকর হিসেবে গ্রহণ করলেও, নায়িকার অভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ, মানব ও স্বর্গের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং নিজের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মাধ্যমে তাঁর রচিত *শকুন্তলা* নাটকটি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। পৌরাণিক চরিত্র শকুন্তলার এই বিনির্মাণে শুধু পৌরাণিক উপাখ্যান নয়, বরং মানব জীবনের জটিলতা, নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং আধুনিক চেতনার অন্তর্দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। সেলিম আল দীন-এর শকুন্তলা তাই বাংলা নাট্যধারায় পৌরাণিক চরিত্রের বিনির্মাণের এক অনন্য উদাহরণ। এটি দেখায় কীভাবে পৌরাণিক কাহিনিকে আধুনিক চিন্তাধারার সাথে সমন্বিত করে নাট্যকার নারীর মানবিক, সামাজিক ও মানসিক দিককে প্রাধান্য দিয়ে নতুন সাহিত্যিক ও নাট্যচিন্তায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। সুতরাং, সেলিম আল দীন রচিত শকুন্তলা চরিত্রটি কেবল প্রেম ও মাতৃত্বের প্রতীক নয়; তিনি নারীর আত্মসম্মান, প্রতিরোধ ও আধুনিক সামাজিক চেতনার এক শক্তিশালী রূপ হিসেবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আল দীন, সেলিম (১৯৮৬)। *তিনটি মঞ্চনাটক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

চৌধুরী, জামিল (সম্পাদিত) (২০১৬)। *আধুনিক বাংলা অভিধান*। প্রথম পুনর্মুদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ (২০১৮)। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (১৩৩৯)। *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (দ্বিতীয় খণ্ড)। বিশ্বকোষ প্রেস, কলকাতা

বসু, পূরবী (২০২৩), *প্রাচ্যে পুরাতন নারী*, অবসর, ঢাকা

বালা, বিপ্লব (২০১৫)। *আধুনিক বাংলা থিয়েটার: শিল্প ও রাজনীতি*। সোনার বাংলা প্রকাশন, কলকাতা

ভট্টাচার্য্য, তপোধীর (১৯৯৭)। *ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ*, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা

ভট্টাচার্য্য, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (সম্পাদিত ও অনূদিত) (১৪২২)। *মহাভারত, আদিপর্ব, ২য় খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (২০১০)। *বিষ্ণু পুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা

তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত) (২০০২)। *বায়ু পুরাণ*, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা

তালুকদার, ময়না (২০১৪)। 'কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ও সেলিম আল দীনের শকুন্তলা : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা', *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, অধ্যাপক দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য গবেষণা কেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রহমান, লুৎফর (২০১০)। *কালের ভাস্কর সেলিম আল দীন*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা

রায়, কুমার (১৯৮৭)। *নাট্যভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ*, প্রতিভাস, কলকাতা

Howard, Richard [Trans.] (1972). *Mythologies: The CompleteEdition, in a New Translation*. Hill and Wang, France